যুদ্ধ ও শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং ‘শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ’ সম্পর্কে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ নিয়ে বিশ্বের কমিউনিস্টদের মধ্যে বিশেষত সোভিয়েট পার্টি ও চীনের পার্টির মধ্যে গুরুতর মতাদর্শগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৫৯ সালে কলকাতা জেলার এক কর্মী বৈঠকে একটি ভাষণ দেন।

বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, প্রধানত যুদ্ধ ও শান্তি, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রশ্নে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে আদর্শগত ক্ষেত্রে বহু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কমিউনিস্ট লীগ অব যুগোশ্লাভিয়ার মতামত বাদ দিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কমরেড ক্রুশ্চেভের’ নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মতামত যা বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, তার কিছু কিছু বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিউনিস্ট মহলে গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তিধারা হচ্ছে — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রেণী সমাবেশের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি ‘মৌলিক পরিবর্তন’ ঘটেছে, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লব প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির কয়েকটি, যেগুলির কার্যকারিতা গত বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্তও পুরো বিদ্যমান ছিল, আজ তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। সুনির্দ্দিষ্টভাবে বললে, বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্বের মতে, সারা দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা ইত্যাদি বিষয়ে লেনিনের মতামতগুলির ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া ঐ নেতারা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করে না দিলেও বর্তমানে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের সাধারণ নিয়ম হিসাবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন।

এঁরা লেনিনের সময়কার সাম্রাজ্যবাদী যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে বর্তমান সময়ের সাম্রাজ্যবাদী যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির ‘মৌলিক পার্থক্য’ বোঝাতে গিয়ে বলছেন, যেহেতু আমাদের যুগ হচ্ছে ‘সাম্রাজ্যবাদের ভাঙনের’ যুগ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আরও অগ্রগতি ও বিকাশের যুগ, সেহেতু শুধুমাত্র ‘সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লব’ বিষয়ে লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আজকের যুগের যথাযথ তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। তাই এঁদের মতে, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়ম নির্ধারণের প্রশ্নে লেনিনের মতামতগুলি তার প্রয়োগ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ;এবং যারা আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে লেনিনের সিদ্ধান্তগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে, তারা আন্তর্জাতিক শ্রেণী সমাবেশের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটে গিয়েছে তার যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছে না;ফলে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে ‘সাম্রাজ্যবাদের ভাঙনের’ যুগেও সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও সামর্থ্যকে অযথা বড় করে দেখছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির, শান্তি আন্দোলনের ও দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শক্তিকে খাটো করছে।

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে শুধু আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ্ ইন্ডিয়াই নয়, অন্যান্য কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টিও একমত হতে পারছে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ও তার তাৎপর্য কী, তা অনুধাবনের ক্ষেত্রেই মূলত মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক দৃঢ়তার সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণের ব্যাপারে অথবা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা করার বাস্তব সম্ভাবনা সম্বন্ধে কারুরই কোন মতপার্থক্য নেই। মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে, শান্তিরক্ষা করার জন্য কার্যকরী পন্থা অনুসরণের ব্যাপারে এবং এ দুটিকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম এবং উপনিবেশ ও

আধাউপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার ব্যাপারে। এছাড়া, বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেনিনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী আছে কি নেই, সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। আবার, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বর্তমানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা আদৌ সম্ভব কি না, সে ব্যাপারেও মতপার্থক্য আছে। সর্বোপরি, 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ পার্লামেন্টকে জনগণের ইচ্ছার প্রকৃত যন্ত্রে রূপান্তরের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব'— এই ধারণা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। এমনকী যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, বর্তমান 'পরিবর্তিত' আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা সম্ভব, তথাপি 'পার্লামেন্টারি পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'কে দেশকাল ভেদে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার নানা রূপ (form)-এর মধ্যে 'একটি রূপ' বলে গ্রহণ করা কি মার্কসবাদসম্মত হবে?

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের সামনে উপরোক্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম না হলে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সাম্যবাদীদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

কাজেই বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। এজন্য সর্বপ্রথমে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া সারা দুনিয়াই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের হয় প্রত্যক্ষ দখলে না হয় তাদেরই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকরী প্রভাবের অধীন ছিল। এই একটিমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশও আবার তখন বিশ্বপুঁজিবাদ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিল। রাষ্ট্রগতভাবে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া তখন আর কোন দেশ আন্তরিকভাবে শান্তির জন্য লড়াই করেনি। কিন্তু বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করা সত্ত্বেও একা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের এত শক্তি ছিল না যার দ্বারা সে দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাধাবার হীন ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে পারে। বরং শক্তির জোরে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরাই তখন যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে 'শেষ কথা' বলার ক্ষমতা রাখত। ফলে, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ীই তখন যুদ্ধ বাধত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরের পাশাপাশি ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনামকে নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বিশ্বসমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর ফলে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের সমান্তরাল একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বাজারের জন্ম হয়েছে। এই সমাজতান্ত্রিক বাজার হিসাবে একটি বিরাট ভূখন্ড পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার ফলে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বাজারের উপস্থিতি ও বিকাশ এবং তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীদের অনেকাংশে কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির ক্রমবর্ধমান উত্তাল তরঙ্গ এবং তার সামনে পড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের পশ্চাদপসরণ বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদীরা এই নতুন পরিস্থিতির সামনে পড়ে নিজেদের স্বার্থেই তাদের পুরানো ঔপনিবেশিক নীতি বদলাচ্ছে, তারা উপনিবেশ-গুলির জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করছে এবং নানা সমঝোতা ও চুক্তির মধ্য দিয়ে এই পূর্বেকার উপনিবেশগুলিতে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। এশিয়া-আফ্রিকার এই নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্বেকার উপনিবেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করছে, যা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজারকে ক্রমাগত আরও সঙ্কুচিত করছে। শুধু তাই নয়, এইসব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কিছু কিছু দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই সঙ্কুচিত বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতিযোগী রূপে আসছে।

এইভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বাজারের উপস্থিতি ও বিকাশ এবং তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামগুলির উত্তাল জোয়ার, পূর্বেকার উপনিবেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হিসাবে আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি

সম্মিলিতভাবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ নানা দ্বন্দ্বের সংঘাতকে প্রবলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভাঙনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি যদিও দীর্ঘকাল আগেই সাধারণ সঙ্কটের পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল, তথাপি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মন্দা ও ক্ষয়ের প্রবণতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে বিকাশ ঘটেছিল। কারণ, তীব্র সঙ্কটের মধ্যেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পুঁজিবাদী বাজারের একটি 'আপেক্ষিক স্থায়িত্ব' ছিল। কিন্তু বর্তমান নতুন পরিস্থিতিতে 'বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্বের' সেই নিয়ম আর কার্যকর নেই। তাই নিজ নিজ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেওয়া সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের পক্ষে আরও কঠিন হচ্ছে, যার ফলে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট রূপ ধারণ করছে। সঙ্কট যত তীব্রতর হচ্ছে ততই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনীতির সামরিকীকরণ (militarisation) বৃদ্ধি পাচ্ছে ; সামরিক ব্যয় ক্রমাগত বাড়াবার মারফৎ কৃত্রিম তেজীভাব সৃষ্টি করে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বজায় রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা চলছে।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতেই যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নকে বিচার করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্মিলিত শক্তি এককভাবে[১] সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি। তার সঙ্গে আবার এশিয়া আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থেই, সাময়িকভাবে হলেও শান্তির শিবিরে যোগ দিয়েছে।[২] তাছাড়া, গোটা দুনিয়ার শান্তিকামী জনসাধারণ আজ সমস্ত অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে। দুনিয়াজোড়া শান্তি আন্দোলনের পক্ষে ক্রমেই জনমত প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যকার সংঘাত আরও নগ্ন ও প্রকট হয়েছে; পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে এবং উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি প্রবল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে — এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য একযোগে সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিকে প্রভূত পরিমাণে দুর্বল করে দিয়েছে। সংক্ষেপে বললে, যুদ্ধের শক্তির তুলনায় শান্তির শক্তি আজ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের নেতৃত্বে সংগঠিত বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের পক্ষে আজ যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ওপর জোর করে শান্তি চাপিয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অপর দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করার নীতিকে কার্যকরীভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব। এই অনুকূল পরিস্থিতির ফলে বিশ্বশান্তি রক্ষা করার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর থেকে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে যুদ্ধের জন্ম দেয় — লেনিনের এই সিদ্ধান্ত আজ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, তা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ আজ আর আগের মত একটি সর্বব্যাপ্ত বিশ্বব্যবস্থা (all embracing world system) হিসাবে বিরাজ না করলেও এবং পূর্বের তুলনায় প্রভূত পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়লেও, সাম্রাজ্যবাদী যুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে লেনিনের ব্যাখ্যাগুলির সঠিক উপলব্ধি থাকলে এবং শান্তির পক্ষে প্রভূত শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা অভিভূত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান লোপ না পেলে একথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ আপনাআপনি নিজে থেকে ধ্বসে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদের আর আঘাত করার বা যুদ্ধ বাধাবার শক্তি বর্তমানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদ শুধু যে আজ একটি বিশ্বব্যবস্থা (world system) হিসাবে টিকে আছে তাই নয়, তা আজও কার্যকরী শক্তি নিয়ে অবস্থান করছে। সবদিক থেকে কোণঠাসা হওয়ার ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে অর্থনীতির যত সামরিকীকরণ করা হচ্ছে, তত সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের ঝোঁকও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অস্ত্র সজ্জা ও সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অতীত রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ঘিরে আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিগুলি সর্বদাই যেকোন মুহূর্তে আক্রমণ করবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। পশ্চিম জার্মানিতে সাম্রাজ্যবাদীরা আবার জার্মান প্রতিহিংসাবাদকে জাগিয়ে তুলেছে। জাপানে সামরিকবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটানো হয়েছে। যদিও পরিস্থিতির চাপে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুরানো ঔপনিবেশিক নীতি কিছুটা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তাদের আগ্রাসী নীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তারা ঘটায়নি। দুর্বল ও পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি করে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক

দ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত আজও পূর্বের মতই বলবৎ রয়েছে।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটার (quantitative change leads to qualitative change) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি থাকলে একথা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, একটি ফেনোমেনন-এর (বিষয় বা সত্তার) অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী শক্তিসমাবেশের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন যে পরিমাণেই সাধিত হোক না কেন, বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মারফৎ সেই বিশেষ ফেনোমেননটির জায়গায় নতুন একটি ফেনোমেনন সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত, পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে ফেনোমেননটির গুণগত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সেই ফেনোমেননটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার আভ্যন্তরীণ নিয়ামক শক্তিগুলির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় না। কাজেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাত্রেরই জানা উচিত, প্রতিটি যুগ-এর (epoch) বিকাশের প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরনের গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। কিন্তু এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও যুগের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ততদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতদিন না পুরানো যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে।

বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেযদি সাধারণভাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ আর পূর্বের ন্যায় অনিবার্য নয় তবে সেটা এক জিনিস এবং এভাবে বলা ভালও বটে;কিন্তু একথার সাথে যদি 'সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত অকার্যকরী হয়ে গেছে'— এই ভ্রান্ত ধারণা মিলিয়ে দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। বিশ্বের সামাজিক শক্তিগুলির মেরুকরণের ফলে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী যুদ্ধ শিবির এবং সোভিয়েট ও চীনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রধান নিয়ামকরূপ নিয়ে উপস্থিতহলেও বর্তমান যুগে যুদ্ধ বাধবার মূল কারণ এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিহিত নয়। আধুনিক যুদ্ধের মূল কারণ নিহিত রয়েছে বাজার দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির পরস্পরের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের মধ্যে।

সারা দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়া অথবা দুনিয়াজোড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দ্বারা দু'একটি পুঁজিবাদী দেশ পরিবেষ্টিত হওয়ার মত পরিস্থিতি দেখা দিলেই একমাত্র যুদ্ধকে মানবসমাজ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব। তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া আজ আর সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার না হলেও সমাজতান্ত্রিক শিবির যে আজও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবির কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং আঞ্চলিক ও আংশিক নানা রূপে যুদ্ধ যে এখনও চলছে এবং যার মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ সৃষ্টি হওয়ার বিপদ রয়েছে — কোন মোহের বশবর্তী হয়ে এই কঠোর বাস্তব সত্যটিকে ভুলে গেলে শান্তির বিজয়কে কার্যকরী করার ব্যাপারে বাস্তব পন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে, দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনকে তত্ত্বগতভাবে নিরস্ত্র করে ফেলা হবে এবং নানা ধরনের সংস্কারবাদী-শোধনবাদী ঝোঁক যা সাম্যবাদী আন্দোলনে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বস্তুত আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটির কথা ছেড়ে দিলেও ইতিমধ্যেই পৃথিবীর কিছু কিছু পুঁজিবাদী দেশের সাম্যবাদী দলগুলির আচরণের মধ্যে — 'যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেনিনের থিসিস এখন অচল' — এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। এর ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত ইচ্ছা পোষণ করা সত্ত্বেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ষড়যন্ত্রকেই শক্তিশালী করা হবে।

কাজেই সাম্যবাদীদের মনে রাখতে হবে, আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তি রক্ষা করার সম্ভাবনা এবং যুদ্ধ লেগে যাওয়ার বিপদ দুই-ই বাস্তব সত্য। এর একটির ওপর অনাবশ্যক জোর দিতে গিয়ে অপরটিকে খাটো করে দেখলে অমার্জনীয় ভুল করা হবে। এবং এই ধরনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই কিছু কিছু কমিউনিস্ট নেতা শান্তি রক্ষা করার বাস্তব পন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে রাষ্ট্রসংঘের ভেতরে ও বাইরে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালানো, নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব, শান্তি আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক শিবির কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ প্রভৃতি বিষয়গুলির (শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে এইসব বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই) উপরেই মুখ্যত জোর দিচ্ছেন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও তীব্রতর করা, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে শক্তিশালী করার (যার ওপর সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং স্থায়ীভাবে শান্তিরক্ষা নির্ভর করছে)

গুরুত্বকে খাটো করে দেখছেন। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন, পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে তীব্রতর করার উপর মূলত ভিত্তি করে শান্তি আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই শান্তিকে স্থায়ীভাবে ও কার্যকরীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

'যুদ্ধ ও শান্তি' অথবা 'পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি' বা অন্য যে কোন প্রশ্নই হোক, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সর্বদা বিপ্লবের গতিকে ত্বরান্বিত ও তীব্রতর করার উদ্দেশ্যেই তা বিচার করে থাকে। কাজেই শান্তি আন্দোলনের মত একটি গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার সময় কমিউনিস্টদের একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়া শান্তবাদীদের (bourgeois pacifist) মত যেকোন মূল্যে নিছক শান্তিরক্ষার জন্য আজকের দিনের ব্যাপক ও শক্তিশালী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন নয়। শান্তি আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণের বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আমাদের কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণকে শুধুমাত্র জার ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি, পশ্চিমী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে এবং তাদের পরাস্ত করে বিপ্লবকে জয়যুক্ত ও রক্ষা করতে হয়েছে। চীনের বিপ্লবকেও শুধুমাত্র চিয়াং কাইশেক শাসন নয়, গোটা আমেরিকার মিলিটারি শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করার মারফৎ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করতে সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করতে পারলে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণের পক্ষে নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে শত্রুশিবিরকে মোকাবিলা করার মারফৎ বিপ্লবী আন্দোলনকে জয়যুক্ত করা আগের থেকে সহজ হবে। কাজেই পুঁজিবাদী এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লবী শক্তিগুলি যাতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থায় তাদের বিপ্লবী লড়াইগুলি পরিচালনা করতে পারে তার উপযুক্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও বজায় রাখাই বর্তমান যুগের শান্তি আন্দোলনের ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণের যথার্থ বৈপ্লবিক তাৎপর্য। কাজেই বর্তমান দুনিয়াজোড়া শান্তি আন্দোলন অথবা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিটি একটি কূটনৈতিক চাল নয় অথবা যুদ্ধ প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য কালক্ষেপ করার সূক্ষ্ম কৌশল নয়, যা অনেক মেকি মার্কসবাদী ভাবছেন। পক্ষান্তরে, সঠিকভাবে বুঝলে, দুটিই হচ্ছে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, যা আজ বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার গতিকে ত্বরান্বিত করার অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। সাম্প্রতিককালে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির শক্তি অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে আপেক্ষিক অর্থে সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে আজ দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল হয়েছে। এই গতিবেগকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান শান্তি আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি পরিচালনা করতে হবে।

দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে এই অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াই যে বর্তমানে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যথার্থ তাৎপর্য, তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই বর্তমান শান্তি আন্দোলনের চরিত্র, সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব, এবং নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া দেশগুলির একদিকে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে আবার পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে এদের দ্বন্দ্ব — প্রভৃতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারার ফলে এবং শান্তির প্রশ্নে মোহের বশবর্তী হওয়ার দরুন এইসব অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া দেশগুলির বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আচরণকেও বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও অকারণে সহ্য করা হচ্ছে। বস্তুত এইসব দেশগুলির সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনেকক্ষেত্রে এমন কায়দায় অনুসরণ করছে যা তোষামোদেরই নামান্তর।

বিপ্লবী আন্দোলনগুলির বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তি আন্দোলন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে বহু বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ও

ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনগুলি আদর্শগত ও সাংগঠনিক দিক থেকে বাস্তবে কতটা শক্তিশালী হচ্ছে — এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কোন অজুহাতেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

এই প্রশ্নটির নিরিখে ভারত, বর্মা ও এশিয়া-আফ্রিকার অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে জনগণের পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলন ও অন্যান্য গণআন্দোলনগুলির গতিপ্রকৃতি পরীক্ষা করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, এই সব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে বাস্তবে আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করে ফেলা হচ্ছে। এইসব দেশগুলির শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং যুদ্ধ বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ যা বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষে বাস্তবে সাহায্য করছে, তাকেই কেবলমাত্র উচ্চকণ্ঠে তারিফ করা হচ্ছে, কিন্তু (১) সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য শান্তি নীতি ও এইসব দেশগুলি কর্তৃক অনুসৃত অনির্ভরযোগ্য শান্তি নীতির মৌলিক পার্থক্য, (২) এইসব দেশগুলির রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দিনের পর দিন ফ্যাসিবাদের নানা রূপে আত্মপ্রকাশ, (৩) সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদের ঝোঁক যা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেশে সময় ও সুযোগ মতো নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করছে এবং সর্বোপরি (৪) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগতিকে দমন করার ক্ষেত্রে এশিয়া ও আফ্রিকার ভূখণ্ডে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসাবে এরাই যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে যাচ্ছে — প্রভৃতি বিষয়গুলি একেবারেই লক্ষ্য করা হচ্ছে না। এবং এইসব বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণকে নিরবচ্ছিন্ন আদর্শগত সংগ্রামের মারফৎ সচেতন করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

উপরন্তু, বিংশতি কংগ্রেসের পর থেকেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বক্তৃতা ও লেখার মারফৎ বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বেশ কিছু পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে ক্রুশ্চেভ বলেছেন ঃ "এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যখন তারা মেহনতী কৃষক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে সামিল করার দ্বারা এবং যারা পুঁজিপতি ও জমিদারদের সাথে আপস করে চলবার নীতি পরিত্যাগ করতে অক্ষম সেই সুবিধাবাদীদের দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করার দ্বারা জনস্বার্থের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে পারে, পার্লামেন্টে স্থায়ী গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে এবং পার্লামেন্টকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ থেকে রূপান্তরিত করতে পারে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার যন্ত্রে।" এইসব নেতারা এখনও পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের নিয়মকে একেবারে বাতিল না করে দিলেও বর্তমান 'পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি'র সাধারণ নিয়ম হিসাবে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনার উপরেই উত্তরোত্তর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। এইসব মতামতগুলির দ্বারা নিঃসন্দেহে সাম্যবাদীদের আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তা ইতিমধ্যেই শোধনবাদী প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পূর্বেই আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, শান্তি রক্ষা করার বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কিভাবে সোভিয়েট পার্টির নেতারা আজও যে নানা রূপে যুদ্ধের বিপদ বর্তমান তা খাটো করে দেখাচ্ছেন। এই বিভ্রান্তির কারণ দুটি ঃ (১) আজকের পরিস্থিতিতেও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়ম যে বলবৎ আছে, তা বুঝতে অক্ষম হওয়া এবং (২) বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ার দিকটিকে কোন একটি পুঁজিবাদী দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার সাথে গুলিয়ে ফেলা।

এই সমস্ত তাত্ত্বিকরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এবং শান্তির পক্ষে খন্ড খন্ড ও সাময়িক বহু বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও আজও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রশক্তি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভয়ে নিজ দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণী ও জনতার বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে গলা টিপে মারতে ভয় পাচ্ছে। এমন নজির দুনিয়ার কোনও একটি পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে না। বাস্তবে এর উল্টোটাই ঘটছে। এমনকী ন্যূনতম অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিতে সাধারণ আন্দোলনগুলিকেও পুঁজিপতিশ্রেণী ফ্যাসিবাদি কায়দায় দমন করছে। পার্লামেন্টারি রাজনীতির পুরানো ঐতিহ্য বহনকারী দেশগুলিতে পর্যন্ত পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে ক্রমেই খর্ব করা হচ্ছে। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছেও লোপ পাচ্ছে। অগ্রসর-অনগ্রসর সকল পুঁজিবাদী দেশেই রাষ্ট্রশক্তি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নানারূপে ফ্যাসিবাদ ক্রমশই বেশি করে আত্মপ্রকাশ করছে। এইরকম একটি কঠোর বাস্তব পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের

তত্ত্ব প্রচার করা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চেতনার মান কতটা নিম্ন হলে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মোহের দ্বারা কতটা আচ্ছন্ন হলে সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু চিন্তার দেউলিয়াপনা সবচেয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে 'জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার যন্ত্রে' রূপান্তরিত করার মারফৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ধারণার মধ্যে। একথা সত্য যে, শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে তত্ত্বগত দিক থেকে মার্কসবাদ একেবারে বাতিল করে দেয়নি। বর্তমানের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তরণ আদৌ সম্ভব কি না, এই প্রশ্নে বিতর্ক আছে। আমরা মনে করি, তা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি এমনকী ধরেও নেওয়া যায় যে, শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব, তাহলেও "বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ পার্লামেন্টকে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার যন্ত্রে রূপান্তরিত করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার" তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং এর সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। উৎপাদনের বিকাশের কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে, বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরকাঠামো রূপে কোন্ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক রূপ হিসাবে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের উদ্ভব ঘটেছিল — সেকথা এইসব তাত্ত্বিকদের জানা থাকলে, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে, সর্বহারা গণতন্ত্র — দেশকাল ভেদে তার রূপের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, মূল চরিত্রগত দিক দিয়ে তা বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতন্ত্র (সব ধরনের বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান) থেকে মৌলিকভাবে আলাদা এবং সেকারণেই এক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপর শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে না। পুঁজিবাদী সমাজের ভিতের (base) বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপরকাঠামো (superstructure) হিসাবে যা গড়ে উঠেছে, তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপরকাঠামোর কাজ করতে পারে না শুধু তাই নয়, তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিতের উন্নয়ন ও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে বাধ্য। তাই, নতুন ভিতের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটাবার জন্য পুরানো ভিতের অবলুপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর কাছে কোনও পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — যদি তা আদৌ সম্ভবও হয় — বলতে বোঝায়, বুর্জোয়ারা প্রতিরোধ না করলে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা দখল, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসসাধন ও তার স্থানে নতুন ধরনের রাষ্ট্র — সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এর দ্বারা কখনই বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সংস্কারের (reform) দ্বারা সর্বহারা রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা বোঝায় না — যা বাস্তবে করাও যায় না। এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আবার শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্লামেন্টের অবলুপ্তি বোঝায়, সংস্কারের দ্বারা পার্লামেন্টকে 'জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে' রূপান্তরিত করা বোঝায় না — যেটাও বাস্তবে করা অসম্ভব। সবশেষে, তত্ত্বগত প্রশ্নে বর্তমানের এই মতবাদিক সংগ্রামের (polemical discussion) ফল আপাতত যাই হোক না কেন, সাম্প্রতিককালে কমিউনিস্ট কর্মীদের তত্ত্বগত চেতনার মানের যে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই মতবাদিক সংগ্রাম সেই চেতনার মান কিছুটা উন্নত করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে। এই দিকে থেকে এই ধরনের মতবাদিক আলাপ-আলোচনা আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৬০, গণদাবী'র বিশেষ সংখ্যায়
১ অক্টোবর, ১৯৬২ সালে ইংরেজি মুখপত্র 'সোস্যালিস্ট ইউনিটি'তে।
জুলাই, ১৯৫৯ ভাষণটি প্রদত্ত হয়।

১। পরবর্তীকালে 'রেনিগেড'-এ পরিণত।

২। এই প্রবন্ধটি লেখার সময় বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুতার রূপ পরিগ্রহ করেনি।

৩। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় পণ্ডিত নেহেরুকে শান্তির চ্যাম্পিয়ান হিসাবে প্রশস্তি গেয়েছে ; কিন্তু তারা যে কতবড় ভুল করেছিল পরবর্তীকালের ঘটনা তা প্রমাণ করেছে।